প্রথম আলো

সম্পাদকীয়

শিক্ষার্থীদের শিখনঘাটতি

ইউনিসেফের গবেষণা শিক্ষার জন্য সতর্কবার্তা

প্রকাশ: ১১ মে ২০২৬, ০৯: ৩০

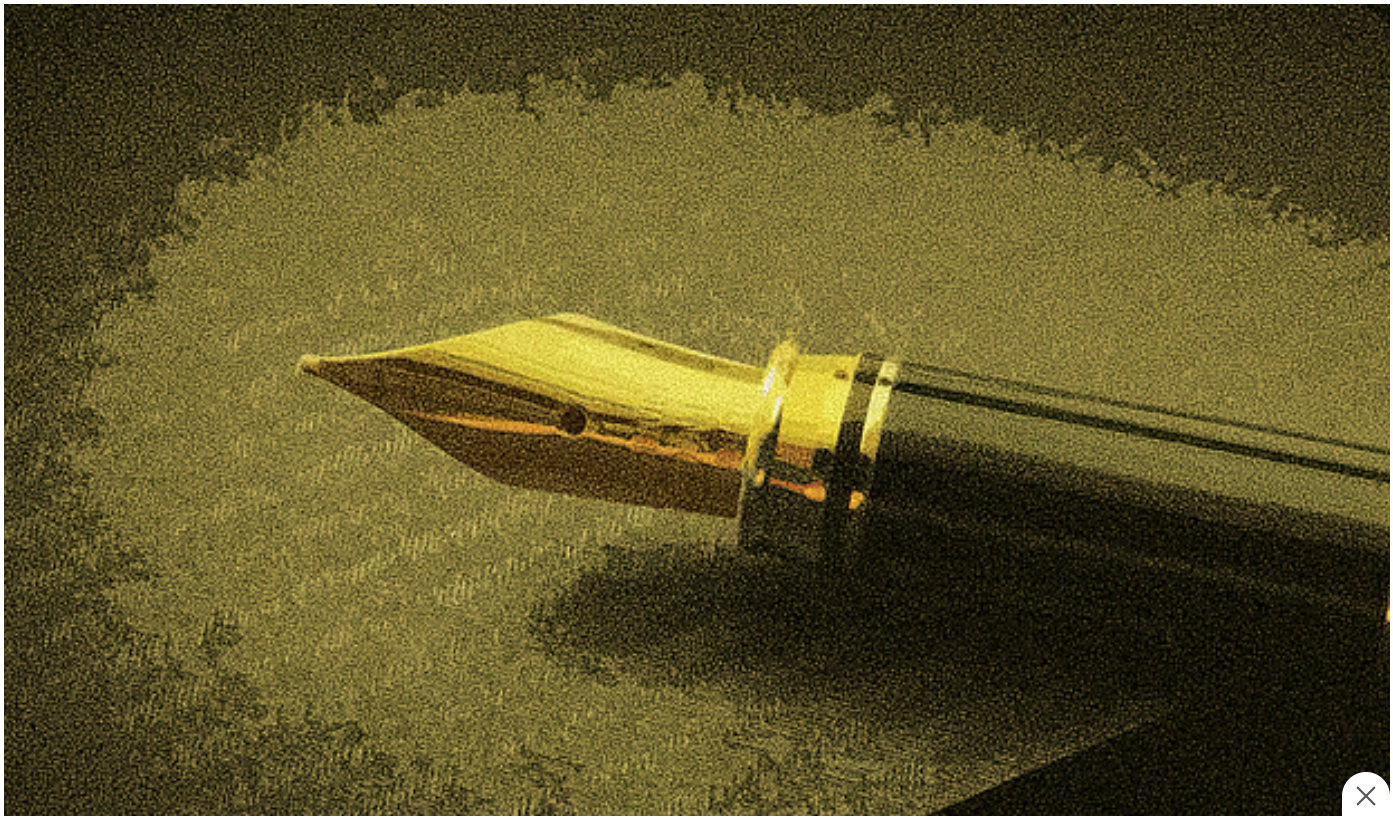

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংকট নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছে। কিন্তু সম্প্রতি ইউনিসেফের গবেষণা যে বাস্তব চিত্র সামনে এনেছে, তা শুধু উদ্বেগজনক নয়; একই সঙ্গে আমাদের শিক্ষার মান নিয়েই নতুন করে প্রশ্ন তোলে। গবেষণাটি দেখিয়েছে, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠা অধিকাংশ শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণির মৌলিক দক্ষতাও অর্জন করতে পারেনি। গণিতে ৯১ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরে আটকে আছে, বাংলাতেও পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়। আরও ভয়াবহ হলো, প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী নিজেদের শ্রেণি অনুযায়ী পাঠই পড়তে পারে না। শিক্ষার্থীদের মারাত্মক এই শিখনঘাটতি শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত সংকটের প্রতিচ্ছবি।

এই সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘শেখানো’ নয়, বরং ‘সিলেবাস শেষ করার’ সংস্কৃতি। গবেষণায় ৯০ শতাংশ শিক্ষক জানিয়েছেন, নির্ধারিত পাঠ্যসূচি শেষ করার চাপে তাঁরা পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারেন না। অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই শেষ করা। শিক্ষার্থীরা আদৌ শিখল কি না, সেটি বিবেচ্য নয়। ফলে শ্রেণিকক্ষে দুর্বল শিক্ষার্থীরা ক্রমেই আরও পিছিয়ে পড়ছে এবং শিক্ষকেরাও কার্যত একটি অকার্যকর কাঠামোর ভেতর কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, পাঠ্যক্রম কাদের জন্য? যদি অধিকাংশ শিক্ষার্থীই সেই পাঠ্যক্রমের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারে, তাহলে পাঠ্যক্রম যত আধুনিক হোক, বাস্তবে তার কার্যকারিতা থাকে না। ইউনিসেফের গবেষকেরা যথার্থই বলেছেন, এখনকার বাস্তবতায় পুরো শ্রেণিই প্রত্যাশিত মানের নিচে অবস্থান করছে। অর্থাৎ সমস্যা কেবল কয়েকজন দুর্বল শিক্ষার্থীর নয়; বরং গোটা ব্যবস্থার ভিত্তিই দুর্বল।

বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে পাঠ্যক্রমে একের পর এক পরিবর্তন আনা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ৬০ শতাংশের বেশি প্রধান শিক্ষক মনে করেন, ঘন ঘন এই পরিবর্তন শিক্ষার মানোন্নয়নে বাধা তৈরি করছে। নতুন পদ্ধতি চালুর আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ, শিখনসামগ্রী কিংবা মূল্যায়ন-কাঠামো নিশ্চিত না করেই পরিবর্তন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক—তিন পক্ষই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, বছর শুরুর সময় ৯৩ শতাংশ শিক্ষক নতুন মূল্যায়নপদ্ধতি নিয়ে আত্মবিশ্বাসী থাকলেও বছর শেষে তা কমে ৫৪ শতাংশে নেমে আসে। এর অর্থ হলো, কেবল প্রশিক্ষণ দিয়ে পরিবর্তন টেকসই করা যায় না।

আমরা মনে করি, এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাও নতুনভাবে ভাবতে হবে। শিক্ষক শুধু পাঠ্যবই শেষ করার যন্ত্র নন; তিনি শিক্ষার্থীর শেখার সহযাত্রী। কিন্তু প্রশাসনিক কাজ, পরীক্ষা, বৈরী আবহাওয়া, স্কুল বন্ধ থাকা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ না পাওয়ার কারণে তাঁদের কার্যকর শিক্ষাদান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষক জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় শিখনসামগ্রী ব্যবহারের মতো পর্যাপ্ত সময় তাঁরা পান না। বাস্তবতা হলো, শিক্ষককে যদি কেবল নির্দেশনা পালনকারী কর্মচারীতে পরিণত করা হয়, তাহলে শ্রেণিকক্ষে সৃজনশীলতা বা মানবিক সংযোগ গড়ে ওঠে না।

শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের বক্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের পরও প্রত্যাশিত ফল কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে শুধু বাজেট বাড়ালেই হবে না; বরং সেই অর্থ কীভাবে ব্যয় হচ্ছে, তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের প্রকৃত সাফল্য নির্ধারিত হবে শিক্ষার্থীর শেখার সক্ষমতা দিয়ে; অবকাঠামো বা প্রকল্পের সংখ্যা দিয়ে নয়।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। কেবল নতুন পাঠ্যক্রম বা প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ দিয়ে এই সংকটের সমাধান হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, শিক্ষা হতে হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক; সিলেবাসকেন্দ্রিক নয়। আমরা মনে করি, ইউনিসেফের এই গবেষণা আমাদের শিক্ষার জন্য একটা বড় সতর্কবার্তা। শিক্ষার্থীদের শিখনঘাটতি কমাতে শুধু নীতিমালা প্রণয়ন করাটাই যথেষ্ট নয়, বাস্তবায়নের দিকেই মূল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো